বাংলা গান, বাঁকবদল ও ব্যান্ডের গান

সুপ্রিয় রায়

গানবাজনার ভাগ্যটা এক ধাক্কায় অনেকটা পালটে গিয়েছিল রেকর্ডিং ব্যবস্থার উদ্ভাবনের ফলে। তার আগে, গান আটকে থাকত গাইয়ের শরীরের কয়েক ফিট দূরত্বের মধ্যে, যতটুকু পর্যন্ত তাঁর গলার আওয়াজ পৌছোয়। গায়কের কাছাকাছি পৌছোতে পারলে তবে তার গানের রস শ্রোতার কানে পৌছোতে পারত। সে যুগে জন্মালে, হয়তো বাঙালি হয়েও হেমন্ত-কণ্ঠ শোনা হত না—ছোটো যে বৃত্ত তাঁর কাছে পৌঁছে পরিবেশন শুনতে পারত তার মধ্যে ভিড়তে না পারলে। যেমন, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর কণ্ঠের আওয়াজের অন্তত একটা আন্দাজ পাই, কিন্তু যদুভট্টের গান সম্পর্কে ধারণা সেই। বড়ে গুলাম আলি খাঁ, আমীর খাঁ, বা ফৈয়জ-কণ্ঠ পরিচিত—জানি না, তানসেনের গলা বা গানের গঠন কেমন ছিল।

গান যখন রেকর্ডে ধরা পড়ে বাজারের পণ্য হয়ে উঠতে পারল, সমাদৃতও হল—তখন পুঁজির প্রয়োজনেই গানকে সংখ্যায় বাড়তে হল অনেক। প্রয়োজন হল নতুন নতুন গানের। সুতরাং, যাঁরা শুধুমাত্র মনের তাগিদে ইচ্ছেমতো গান বাঁধবেন তাঁদের দিয়ে আর প্রয়োজন মিটছিল না। এসে পড়ল পেশাদার সংগীতস্রষ্টার যুগ, উৎকর্ষের প্রয়োজনে গীতিকার, সুরকার আর এক দেহে বসবাস করতে পারলেন না, গায়কদেরও পেশার প্রয়োজনে গাওয়া অভ্যাস করতে হল, শৌখিন চর্চার দল চলে গেল অলক্ষ্যে। মাসে মাঝে মাঝে বেরোতে লাগল নতুন নতুন গান। হিট গানের ধরনধারণ বারবার পুনরাবৃত্ত হতে লাগল। হিট শিল্পী, গীতিকার ও সুরকার নিজেদের সাফল্যের রসায়ন নিজেরাই অনুসরণ করতে লাগলেন, করতে লাগলেন অন্যেরাও। ফর্মুলার সন্ধান ও প্রয়োগের চেষ্টায় গানের ব্যবসায়ী নিয়োগ করলেন শ্রেষ্ঠ সংগীত

প্রতিভাদের। শৈল্পিক প্রণোদনার জায়গা নিতে লাগল বাণিজ্যিক প্রেরণা। সৃষ্টির আনন্দের জায়গা নিতে লাগল ধুরন্ধর কৌশল। সবাক চলচ্চিত্র ও তার গান এই ব্যবস্থাকে সহায়তা করল। বেতারও শামিল হল এই যুগ-পরিবর্তনের।

এর থেকে এই অর্থ করলে ভুল হবে যে, গানের শিল্পমান এর ফলে ক্ষুণ্ণ হল। বরং উলটোটাই। নতুন যুগের সজীব মনের অধিকারী প্রতিভাধররা এতে প্রকাশের নতুন দিগন্ত খুঁজে পেলেন। সংগীতভাবুক শ্রোতাও তৈরি হল। সারা বিশ্বের সংগীত পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশার অবাধ সুযোগ পেল। উত্তর-কলকাতার গলি পেল আরবি সংগীতের স্বাদ। বোম্বের শহরতলিকে ছুঁয়ে দিল আফ্রিকার নৃত্যপর ছন্দ। দিল্লির অভিজাত পল্লী লন্ডন ফিলহার্মনিক অর্কেস্ট্রার রস পেল। দেশের নানা প্রান্তের আপাত-বিচ্ছিন্ন ধারাগুলি সজাগ সংগীতমানসে একযোগে ছায়া ফেলতে শুরু করল। উজানির ভাওয়াইয়ার সঙ্গে ভাটির দেশের ভাটিয়াল, ভোজপুরী সংগীত ও সাবেক বাংলার কীর্তন, রাজস্থানি লোকগান ও কর্ণাটকী রাগাশ্রয়ী গান প্রভাবিত করতে লাগল আধুনিক গানবাজনার বৈচিত্র্যসন্ধানী জগতে। ব্যবহৃত হতে লাগল উপাদান ও অনুপ্রেরণা হিসেবে। যেসব শিকড় ছেঁড়া, দলছুট, ভাগ্যান্বেষী সাহসীরা নতুন যুগের গানের জোগানের দায়িত্ব নিলেন তাঁরা সদ্যজাগ্রত বিপুল বাজারের বিরাট চাহিদা মেটাতে নিজেদের প্রকরণের দিক যথাসম্ভব প্রস্তুত করতে বাধ্য হচ্ছিলেন। সেটাতে আনন্দও পাচ্ছিলেন এইসব সংগীত বিপ্লবীরা। ভারতীয় মার্গসংগীতে যাঁর আজীবন সংস্কার, তিনিও যুগের দায় মেটাতে হাত পাতছিলেন ছোটোবেলায় শোনা ছাত পেটানোর গানের কাছে। এই বিরাট সাংগীতিক পাতনপদ্ধতিতে জন্ম নিচ্ছিল অসম্ভব নিরীক্ষাপ্রবণ এক সাংগীতিক ঘরানা। তার সিদ্ধি প্রচুর, তাতে ইতস্তত যুগবাস্তবতার ছাপও যে ছিল না তা নয়। কিন্তু আন্তিম বিচারে তা নিছক বিনোদন, যাতে ব্যবসা বাড়ে।

এর পাশাপাশি গানের জগতে ঘটছিল আরও নানান ভাঙা-গড়া। সময়ের সূক্ষ্ম বিচারে তা আধুনিক রেকর্ড-ধৃত গানের যুগ—যার শুরু বিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ায়—তার থেকেও শতাব্দীখানেক আগে। লোকগানের জন্ম লোকজীবন থেকে, এবং তা বহুকাল ধরে ধীরে ধীরে বিবর্তিত। নগরসভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ মানুষের একটা অংশ যখন কাজের প্রয়োজনে শহরবাসী হচ্ছেন, তাঁরা সঙ্গে করে নিয়ে আসছেন তাঁদের আঞ্চলিক গান। শহরের উথালপাথালে তার রূপ ও সংস্কার পালটে গিয়ে গড়ে উঠছে নতুন যুগ-বাস্তবতার আশা ও হতাশামাখা এক নাগরিক সংগীতের দেহ। ক্লান্ত-দেহ শ্রোতা ও গায়ক এই গানে মূলত খুঁজছেন আমোদ, কিন্তু তারই ফাঁকে

পাশাপাশি আকাশবাণীর light music unit-এর বাজারের দায়মুক্ত পরীক্ষাগারে জন্ম নিচ্ছে নিরীক্ষাপ্রবণ রম্যগীতি, দোসর সংগীতজগৎ বোম্বাইতেও চুটিয়ে কাজ করছেন বাংলার সংগীতনক্ষত্ররা। সেখান থেকেও নতুন নতুন ভাবনা ছড়িয়ে পড়ছে সারা ভারতের সংগীতক্ষেত্রে। সংগীতজমিনে আবাদ চলছে, ফলছে সোনাও।

মুশকিল হল বাস্তবের সংসারে শুধু সোনায় কাজ চলে না, লাগে হাওয়াই চটিও। শুধু প্রেম, নস্ট্যালজিয়া, ঈশ্বরবোধ বা প্রকৃতি বর্ণনায় জীবনের সব দায় মেটে না। তাই একসময়ে এই উড়ান ক্লান্ত হতে বাধ্য। অতীতের মহীরুহরা অনেকেই ক্রমে অবসৃত। অনেকে হতমান, তাঁদের প্রতিভা কালগ্রাসে ক্লান্ত। অনেকে দীনদুনিয়ার মায়া কাটিয়েছেন। বাজার শূন্যতা সহ্য করে না, তাই ফাঁকা জায়গায় ঢুকে পড়ছে নকল, নিম্নমানের পণ্য। বোম্বাই গ্রাস করছে বাংলাগানের সীমিত বাজার। আধুনিক গান ক্রমশ ঢুকে পড়তে চলেছে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে। এই ক্ষয়ের শুরু ছয়ের দশকের শেষার্ধে—চূড়ান্ত চেহারা নেয় আটের দশকের মাঝামাঝি।

অভিজাত ও প্রাণবান বাংলা আধুনিক গানের ঐতিহ্য যখন বিলুপ্তি-মার্গে—তখন তলায় তলায় ঘটছিল পলি জমার ইতিবৃত্ত। বিশেষ কেউ সেটা খেয়াল করেননি, হয়তো করার কথাও না। আটের দশকের মধ্যভাগে যাদের কৈশোর, ৮৭-৮৮ সাল নাগাদ যাদের তারুণ্য কলেজ-যৌবন শুরু, তাদের নিজের যুগের বাংলা গান বলে কিছু ছিল না। কলেজী আড্ডায় বান্ধবীকে মুগ্ধ করতে, বা সামান্য ক্ষণ-ঘনিষ্ঠতাকে অসামান্য করে তুলতে তখনও আমাদের ভরসা পাঁচ বা ছয়ের দশকের বাংলা গান। হিন্দিটা ম্যানেজ করতে পারলে আটের দশকের 'ইজাজত' 'মাসুম' বা জগজিৎ সিং-দিয়ে Repertoire টা বাড়ানোর একটা সুযোগ থাকে। এই অভাবটা সম্পর্কে আমরা যে খুব সচেতন ছিলাম, তাও না—'শোনো কোনো একদিন', 'তার আর পর নেই', 'একঝাঁক পাখিদের মতো কিছু রোদ্দুর' বা 'পারো যদি ফিরে এসো' দিয়ে দিব্যি প্রয়োজন মিটে যাচ্ছিল, সেগুলি এবং এরকম আরও অজস্র সৃষ্টি প্রকৃত অর্থেই এত কালজয়ী, কিন্তু অভাবটা ছিলই। গোপনে একটা তৃষ্ণা নিশ্চয়ই তৈরি হচ্ছিল—যা মেটাতে ৯২-এ আসবেন সুমন। তারপর একে-একে নচিকেতা, অঞ্জন থেকে শুরু করে পল্লব কীর্তনিয়া, তপন সিংহ, কাজী কামাল নাসের—দলছুট মৌসমী ভৌমিক, পুনরাবিষ্কৃত প্রতুল মুখোপাধ্যায়—বাংলা গানের শ্রোতা সেসময় সব্বাইকে যোগ্য সমাদর দেবেন।

এই যে তৃষ্ণা জমে ওঠা, এবং সেটা মেটাবার প্রস্তুতি—খানিকটা শিল্পীর দিক থেকে, আর বেশিটাই শ্রোতার দিক থেকে, তার পেছনে একটা সংগোপন ও অনালোচিত ভূমিকা থেকে গেছে College Fest-এর। College Social বলে যে

ফাঁকে জমে থাকছে থাক্ থাক্ হতাশা, গ্লানি, অবসাদের গল্প, থাকছে প্রতিবাদও, ব্যঙ্গের পিছনে লুকিয়ে। এই গানে লোকশিল্পীর দক্ষতা, প্রাণ ও গভীর জীবনবোধের সঙ্গে মিলছে জীবন-সংশ্লিষ্ট মানুষের সতেজ ঘাম ও অশ্রুসিক্ত জীবন্ত দেহবোধময় সংগীত। কবিগানের নানান ধারা, আখড়াই, হাফ-আখড়াই, থিয়েটারের গান, খেম্‌টা, রূপচাঁদ পক্ষীর গান—এসবই কমবেশি এই ধরনের সংগীত। এখানে সাম্প্রতিক নানা ঘটনার ব্যাখ্যান, টিপ্পনী, প্রতিবাদ ও বিরোধিতাও উপস্থিত, এই গানে ভারতীয় বেদ-পুরাণের নানা অনুষঙ্গ বারবার এলেও, সাধারণভাবে এর দায় সমকালের প্রতি। অনাগত যুগের কোনো শিল্পমাহাত্ম্য বিচারের ধারই ধারে না এই গান।

একটু নিম্নবর্গের মানুষের এই সংগীত যখন তুমুল জনপ্রিয়—সাগ্রহে গৃহীত বড়োমানুষের আমোদ উৎসবেও তখনই আবার পাশ্চাত্যের শিল্পভাবনার আলো এসে পড়ছে এদেশের ব্যতিক্রমী প্রতিভাস্পৃষ্ট মনে—জেগে উঠছে রেনেসাঁস।

পাশ্চাত্যের সংগঠিত ব্যকরণবদ্ধ, উচ্চ-আদর্শ ও ভাবনাময় সংগীতের আদর্শ প্রভাবিত করছে এদেশের সংবেদী মনকে। ক্রমে এলেন রবীন্দ্রনাথ, এলেন অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত। ভদ্রজনের রুচির তীক্ষ্ণ বিচারে ক্রমে পিছু হটে গেল নগরসংগীতের সাবেক ঘরানাগুলি। তলিয়ে গেল শুকিয়ে পড়ল অন্তঃসলিলা নদীর মতো। মনে হল, যেন লুপ্ত হয়েই গেছে।

প্রায় শতাব্দীখানেক সময় এই গানের কোনো খোঁজই ছিল না। এর মধ্যে বাংলা-গানবাজনার জগতে অসংখ্য অনুপম শিল্পকীর্তির জন্ম দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। পরবর্তীতে অন্য সংগীতপথের পথিক নজরুলও। পরের দশকে এঁরা সরে যাবার পর এল দশকের-পর-দশকে ক্রমাগত পরিবর্তিত হতে থাকা আধুনিক গানের যুগ। পঙ্কজ মল্লিক, শচীনদেব বর্মন, সলিল চৌধুরী, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, অনুপম ঘটক, সুধীরলাল, রবীন চট্টোপাধ্যায়, নচিকেতা ঘোষ, সুধীন দাসগুপ্ত—এবং সমর্থ অসংখ্য কণ্ঠশিল্পীর সমন্বয়ে গড়ে উঠল নবীন যুগের নতুন শিল্পসমৃদ্ধ গানের কেল্লা। প্রাতঃস্মরণীয় সংগীত মহাপুরুষরা তখন যে উপাদানকেই ছুঁয়ে দিচ্ছেন, স্পর্শমুখে সেই সোনা হয়ে উঠছে।

এর মধ্যেও, হীরকদ্যুতিময় গানের সহস্রধারার মাঝেও সমাজের বয়স বাড়ছিল। সময় পালটাচ্ছিল, পালটে যাচ্ছিল দিনকাল। কিন্তু গণনাট্য থেকে উঠে আসা সলিল চৌধুরী ছাড়া আর কারও কাজেই যুগ-বাস্তবতা সেভাবে সাড়া দিচ্ছিল না। আধুনিক গান আধুনিকতার দায় মেটাতে ক্রমশ ব্যর্থ হচ্ছিল।

মুনশিয়ানার দিক থেকে বাংলা গানের ভাগ্য তখন উত্তুঙ্গ সাফল্যে। কল্পনার শৌর্যে এবং পরিবেশনের গুণপনায় তখনও স্বরাট বাংলা গান। বাজার-বিশ্বাসী গানের

বস্তু উত্তমকুমারের ছবিতেও দেখা যায় ('সপ্তপদী'তে 'ওথেলো' অভিনীত হয় এই মঞ্চেই)—এ ঠিক তা নয়। এ বর্তমান সময়ের sponsor আশ্রিত ২৫ লাখ টাকা বাজেটের, মুম্বই-শিল্পী সমাহারে চটুল নাচাগানাও নয়। আটের দশকের ছাত্র-ছাত্রীদের সারা বছরের অন্যতম সেরা আকর্ষণ ছিল Presidency College-এর Milieu, Scottish-এর Caledonia, Lady Brabourne-এর সৃজনক্ষমতার এবং আরও অনেক। এখানে নানান বুদ্ধির তীব্র লড়াই চলত কলেজে কলেজে—নানা যুগের নানা তারকাও তৈরি হত, কিছু পকেটমানিও জুটত। এখানে Just a Minute (চালু কথায়, JAM), Pentathalon (পাঁচটা বিষয়ের প্রতিযোগিতা, সবমিলিয়ে চ্যাম্পিয়ন হতে হবে) এসব খেলায় জিতত তুখোড়তমরা। বর্তমানের শিল্প-সাহিত্য-চলচ্চিত্র ও সাংবাদিক জগতের অনেকেই সে সময় থেকেই বন্ধুদের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যুৎপত্তিবান—তখন থেকেই। 'চন্দ্রবিন্দু' খ্যাত, রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত গীতিকার জুটি চন্দ্রিল ও অনিন্দ্য তখন যথাক্রমে বিধাননগর কলেজ ও স্কটিশ চার্চের দল নিয়ে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বী।

এখানে খুব স্বাস্থ্যকর লড়াই চলত বুদ্ধি ও সৃষ্টির ক্ষমতার—এবং চটজলদি স্মার্টনেসের। Ad-spoof নামের ইভেন্টে চালু বিজ্ঞাপনের ব্যঙ্গ-সংস্করণ বানাতে হত। পেন্টাথলনে জিততে নিজস্ব original গান বানানোর ও সেগুলি যন্ত্রপাতিহীন ভাবে গেয়ে মাতানোর দরকার পড়ত, গান লাগত skit জিততেও। এই গান বানানোর প্রতিযোগিতার সূত্রে যেসব গান তৈরি হয় তাতে নয়ের দশকের হতাশা, আনন্দ, টিভি ও বিজ্ঞাপন-শাসিত সময়ের প্রথম অভিজ্ঞতার ছায়া, রাজনীতি ও সুশাসনের বিশ্বাসবিহীন এক ক্লিন্ন যৌবনের ছবি ধরা পড়ত, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যঙ্গ-সূত্রে। Fest এবং পরবর্তী মাস-দুয়েকের Canteen—এই ছিল এই গানের অঙ্গ। কাজেই, বড়ো ভাবনার কথা এখানে বড়ো আসত না। তাৎক্ষণিকতার রসগ্রহণই এখানে মুখ্য মজা, তারই মধ্যে কিছু গান কলেজে কলেজে ঘুরে বেড়াত পিতৃপরিচয়হীন, লোকগানের মতো, টেবিলে টেবিলে গাইত ছেলে-মেয়েরা, রেকর্ডে প্রকাশিত গান নয়, টাটকা গজিয়ে ওঠা নিজেদের সময়ের গানের সঙ্গে সেই আমাদের প্রথম পরিচয়। অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়-এর সুইট-হার্ট, কিংবা দেবাশিস-এর 'MBBS' পরে যথাক্রমে 'চন্দ্রবিন্দু'র গান এবং 'অলীক সুখ' ছায়াছবির গান হিসেবে বিপুল পরিচিতি পেয়েছে। আড়াই দশক আগে এগুলি শুধু কলেজ ছাত্রছাত্রী সংস্কৃতির ছোট্ট ক্ষণস্থায়ী বৃত্তে তুঙ্গ জনপ্রিয়, কিন্তু পিতৃনামহীন, গোত্রহীন রোমাঞ্চ।

একসময়ের ছাত্র-ছাত্রীরা পরবর্তী যুগের সময়ের রূপকার এ কথাটা বই-এর পাতায়, অঙ্কের হিসেবে সত্য হলেও, সবসময় তা ঘটতে দেখা যায় না। এক্ষেত্রে কিন্তু সত্যিসত্যিই ছাত্র-ছাত্রীরা ভবিষ্যৎ বুনছিল। যারা একটু বই-মুখো, তাদের কাছে এটা উত্তর-আধুনিকতার ঢেউ—ছাত্রসমাজের বেলাভূমিতে এসে ভেঙে পড়ার যুগ। দেরিদা, ফুকো, লাকাঁর নাম কিংবা হেজিমনির মতো শব্দ করিডোরে ও কমনরুমে ইতিউতি কানে আসছে। মার্কেজ, ম্যাজিক রিয়েলিজম দিয়ে ছুঁয়ে দিচ্ছেন আট ও নয়ের দশকের নবীন মন। গোর্কি সদন, নন্দন, সরলা রায় মেমোরিয়াল, গ্লোব কি শ্রী সদন কলেজ স্ট্রিটের বিষণ্ণ বিকেলে এনে দিচ্ছে ফরাসি কুয়াশা বা লাতিন আমেরিকার নৃত্যপর সমুদ্রতীর। রাজনীতিতে সুপ্রোথিত বামশাসনে সময়ের গতিও যেন চিরস্থির। প্রেমের রং বাস্তবের প্রহারে ফিকে। আর সে নিয়ে বেদনাবোধও ফুরিয়ে গেছে। মিথ্যে মোহ, সাজানো সারহীন স্মার্টনেস জীবনের যাবতীয় লড়াই চিরতরেই জিতে গেছে। সামনের দিকে উৎসুক তাকানোর জন্য কিচ্ছুটি পড়ে নেই। এবং নেই-যে, তা নিয়ে দুঃখও নেই। এমনই এক আশাহীন, হতাশাহীন, স্মৃতিহীন, বিস্মৃতিহীন সময় ছিল আটের শেষ ও নয়ের শুরুতে। স্বর্ণযুগের গান সে সময়ের দাবি আর কিছুতেই মেটাতে পারছিল না।

এই সময়েই হইহই ঝাঁপিয়ে পড়ল 'তোমাকে চাই'। ৯২-এর এপ্রিলের জন্মক্ষণ থেকে দুর্গাপুজো-র মধ্যেই কলকাতার যুবক-যুবতীর হৃদয়ে-হৃদয়ে কানাকানিতে পৌঁছে গেছে এই অ্যালবাম ও তার কভারে আধো-আলো আধো-আঁধারে দাঁড়িয়ে এক কঠিন পেলব মুখ। সেবারের শীতের ফেস্ট-মহলে তিনি অবিশ্বাস্য তারকা। বাদবাকি বাঙালি সমাজ তখনও আড়মোড়া ভাঙছে, প্রতি পরিবারেরই তরুণরা গলা ফাটাচ্ছেন সুমনের হয়ে। এই গান, যেখানে বারো কি তেরোর রিকশাচালক কিশোরের সাধ ও যাপনের গল্পের ফাঁকে তালের যতি তৈরি করছে সাইকেল-রিকশার প্যাডেলের চেনের মড়মড় শব্দ, দড়িতে ঝোলানো লুঙ্গি ও তিনখানা শাড়ির আড়ালে, ঘুটঘুটে আঁধারের সুযোগে দশ ফুটের ঘরে ঘনিষ্ঠ হচ্ছে বয়স্ক দুই দেহ; যেখানে, পড়ে-পাওয়া চোদ্দো-আনার জীবন মুচকি হেসে আশায় পকেট ভরছে, ভিডিয়ো-ক্যাসেটে নীল সোফাসেটের সিটে খুনসুটি কিংবা ফাঁকতালে মহাপ্রয়াণে এসে যাচ্ছে না সরকারে দরকার না থাকা পাগলের সাপলুডো খেলার—সেই গান, যাকে শুধু সুর-তালের লীলাখেলায় বুঁদ হয়ে বোঝা যাবে না, যা ভাবনায় শান দেবে—কী করে হঠাৎ এভাবে সাগ্রহে গৃহীত হল এমনিতে নূতনত্বের ছোঁয়াচ বাঁচানো বাংলাবাজারে? শুধু ছাত্র-ছাত্রীর নবীনমনের বৃত্তে তো নয়, মাসকয়েকের মধ্যেই এই গান জিতে নেবে

'গোল্ডেন ডিস্ক'—বাজারের হিসেবেও হবে সমসময়ের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক ঘটনা, এর চাবিকাঠি হয়তো লুকিয়ে তার আগে প্রায় এক দশকের কলেজ ফেস্টের জগতে। নতুন যুগকে, তার বাস্তবকে, ভাবার, মুখোমুখি হবার, ব্যাখ্যা করবার প্রস্তুতি যেখানে শুরু হয়েছিল। তৈরি করেছিল সুমনের সমসাময়িক গানের জন্য সমসাময়িক শ্রোতার প্রথম দল। এর পরের দশক বাংলা গানে ঘটনাবহুল, সংগীতবহুলও বটে, ভালো ও খারাপ, দুই-অর্থেই। ৯২-এর পর বছর-বছর সুমনের যুগন্ধর এক-একটি অ্যালবাম। তার বাইরেও অসংখ্য একক অনুষ্ঠানে তাঁর অসামান্য সব সৃষ্টি, যার বহু এখনও রেকর্ডবদ্ধ নয়—শুধু রসিকের স্মৃতিতে স্থায়ী। প্রতিটি সাম্প্রতিক ঘটনায় তাঁর সাংগীতিক প্রতিক্রিয়া, পরপর আসা তথাকথিত 'জীবনমুখী' আন্দোলন। নচিকেতা, অঞ্জন দত্ত, শিলাদিত্য ও তদনুসারী অসংখ্য একক-বিশ্বাসীদের হাতে যখন ব্যাপারটা বাড়াবাড়ি একঘেয়েমির দিকে যাচ্ছে তখন আর-একভাবে রাশ টেনেছিলেন সুমনই, নানা অনুষ্ঠানে পুরোনো বাংলা গান গেয়ে—যে গান তাঁর শ্রোতারা অনেকেই ইতিপূর্বে মন দিয়ে, খেয়াল করে, সম্মান দিয়ে শোনেনই-নি। এরই কাছাকাছি সময়ে হিমাংশু দত্ত সুরসাগরের গান নিয়ে বেরোল তাঁর অ্যালবাম—সমসাময়িক সপ্রতিভতায় গাওয়া ও বাজানো। পরপর এলেন শ্রীকান্ত আচার্য ও ইন্দ্রনীল সেন—ফেলে-আসা যুগের গান ফিরে গেয়ে বস্তুত নতুন করে আবিষ্কার করে তাঁরা বাংলা গানের ইতিহাসকে নতুন করে মনে করিয়ে দিয়ে একটা ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করলেন। সমসময় হইহই করে শুনলেও, 'রিমেক' নাম দিয়ে হেয়-ও করেনি তা নয়। পরবর্তীকালে অবশ্য এঁরা নতুন গানে প্রবলভাবে এসে পড়লেন। এবং যেহেতু সুমন, নচিকেতা, অঞ্জনের মতো এঁরা গায়ক-গীতিকার-সুরকার নন, বহু দশক বাদে বাংলা গানে আবার ফিরে এল নতুন গীতিকার, সুরকার, অ্যারেঞ্জারদের প্রয়োজনীয়তা। কালক্রমে সমীর চট্টোপাধ্যায়, সৈকত কুণ্ডু, জয় সরকার, বাণী কণ্ঠ, অর্ণাশীল—তারও পরে শ্রীজাত—বাংলা গানে নতুন যুগের দাপট এসে গেল। কণ্ঠশিল্পী হিসেবে স্বাক্ষর তৈরি করলেন লোপামুদ্রা মিত্রও।

কিন্তু এসবের পাশাপাশি, বাংলা গানে একটা দলগত উচ্চারণের সংস্কৃতিও গড়ে উঠছিল—যেখানে গানটা প্রধান নয়, গানতুতো বন্ধুত্বের উদ্‌যাপনটা যার অভিজ্ঞান। সুমন তার সমস্ত আধুনিকতা নিয়েও শেষ পর্যন্ত ছয়ের ও সাতের দশকের বিশ্বাসপ্রবণ জীবনধর্মের উপাসক। পিট সিগারের মতোই তিনি আশাবাদী, ভবিষ্যতের সৌন্দর্যে আপ্লুত। তিনি আশা রাখেন 'ইচ্ছে হল একধরনের স্বপ্ন আমার/মরব দেখে বিশ্ব জুড়ে যৌথখামার।' তিনি বলেন, 'সন্ধে নামার সময় হলে/পশ্চিমে নয়, পুবের দিকে/ মুখ

ফিরিয়ে ভাবব আমি/কোন্ দেশে রাত হচ্ছে ফিকে।' তিনি আশা নিয়ে ঘর করেন, আশায় পকেট ভরেন। তাঁর কথায় 'এখনো কিছু হাত হতাশা রুখছে/বাতাসে কাঁপছে প্রাণের স্লোগান/এখনো কিছু মুখ মুখর কণ্ঠ/সজীব রাখছে আগামীর গান/হারিয়ে যেও না হারিয়ে যেও না/রক্তকিংশুক দিনের আশা/এখনো লালে লাল ভোরের আকাশে/ পাঠায় সুখবর ভালোবাসা।'

নয়ের দশকে কিন্তু এই ভালোবাসা আর ছিল না। থাকলেও আগের মতো ছিল না। ছেলে-মেয়েরা প্রেমে পড়ত, আবার হতাশ হলে নিজের দুর্বলতা কাউকে, প্রেমিক বা প্রেমিকাকেও বুঝতে না দিয়ে হেসে ওড়ানোর চেষ্টা করত। রাজনৈতিক পরিস্থিতি তখন নিস্তরঙ্গ। কলেজে সব নির্বাচনই SFI জেতে দু'একটা elite কলেজ ছাড়া। অথচ এই বাম-শাসন যে খুব একটা সমাজতান্ত্রিক আদর্শ মেনে চলছে, যেসব ভালো ভালো কথা বইতে পড়া যায় তা তুলে ধরছে, এমনটা নয়। ভবিতব্যের মতো স্থির এই বামপন্থা প্রায় অরাজনৈতিক—সেখানে কোনো ওঠানামা নেই। এই শূন্যগর্ভ সময়ের গান খুঁজে পাচ্ছিল না যৌবন। হয়তো এমনকি, সুমনেও না। তিনি বড়ো বেশি শ্রদ্ধেয়। বড্ডো সঠিক।

আটের দশকের শেষে কলেজ-ক্রোড়ে জন্ম 'চন্দ্রবিন্দু' ব্যান্ডের, প্রায় একযোগে বিধাননগর কলেজ ও স্কটিশ চার্চ কলেজে এর ডানা মেলা, যদ্দূর জানা যায়। খানিক আনাড়িপনা থাকলেও দ্রুত এদের গানে লাগতে থাকল অভিজ্ঞতার গণ্ডি, প্রতিভার প্রলেপ, চন্দ্রিল, অনিন্দ্য যখন যোগ দিলেন উপল, অরূপ, সুরজিতের সঙ্গে।

পাশাপাশি গড়ে উঠছিল অন্যান্য ব্যান্ডও। গান ভালোবাসে, একসাথে দেশ-বিদেশের গান-বাজনা শোনে, গিটার কি-বোর্ডে হাত পাকায় আর নিজেদের যাপিত জীবনকে গানের কথায় সুরে বাঁধতে চায় এরকম সব বন্ধুবৃত্ত সুমন যুগের সামান্য আগে থেকেই গড়ে উঠছিল। এরাই পকেটমানি বাঁচিয়ে প্রত্যেকটি সুমনানুষ্ঠানে হাজির—শো-শেষে আড্ডা ও ভাবনা-চিন্তার নাড়াচাড়া। এসব বৃত্তই দানা বাঁধতে লাগল ব্যান্ডে। এর আগে নব্যরা গাইয়ে হিসেবে নাম করতে চাইলে সঙ্গে পেশাদার বাজিয়ে নিয়ে যেতেন, প্রথমদিকে নিজের ট্যাঁক-খরচায়, পরে একটু পপুলার হলে উদ্যোক্তার ব্যয়ে। বাদকদের সাথে দুটি রিহার্সাল, এটাই ছিল চল। অ্যাকম্পানিস্ট পালটেও যেত, দরে ও সময়ে না পোষালে। এতে গানের সঙ্গে যন্ত্রের প্রেমটা জমে ওঠার সুযোগ পেত কম। ব্যান্ডে কিন্তু প্রতিটি রিহার্সালে বন্ধুরা গান ও যন্ত্র নিয়ে হাজির। দক্ষতার অভাব যেখানে অনেকটা ঢাকা পড়ছে আন্তরিকতায় ও অভ্যাসে। এখানে গায়ক ও বাদকে চিরাচরিত বর্ণাশ্রম অনুপস্থিত। সম্মানে ও সামান্য

পারিশ্রমিকে সকলের সমানাধিকার ব্যান্ড আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য। গ্রুপ-থিয়েটারের মতো এ-এক দলগত ভাবনার আদর্শস্থিত গানবাজনা—এদেশে সেটা বেশ নতুন।

বিদেশে কিন্তু দীর্ঘকাল এর চল ছিল। আর নয়ের দশকের বিশ্বায়িত দুনিয়ায় সারাবিশ্বের গান-ভাবনার প্রভাব সহজেই এসে পৌঁছচ্ছিল বাংলাবাজারেও। ওপার বাংলার গানবাজনাতেও ব্যান্ড খানিকটা পাশ্চাত্য-প্রভাবেই হয়তো, ততদিনে খুব অভ্যস্ত ব্যাপার। সুমনও আত্মজীবনী 'হয়ে ওঠা গান'-এ স্মৃতিচারণ করলেন তাঁর গানের দল 'নাগরিক অন্য কথা অন্য সুর'-এর। সেখানেও টানাটানির সংসারে দু-একটি যন্ত্র, অনেকগুলি শিক্ষিত-অশিক্ষিত কণ্ঠ, কিন্তু সবমিলিয়ে সমসময়কে গানে ধরার আকূতি। কালট-ফিগার সুমনের এই লেখা বেরিয়েছিল 'শারদীয় আজকাল'-এ। সাম্প্রতিক ইতিহাসের ধুলো সরিয়ে হাতে হাতে পৌঁছে গিয়েছিল নাগরিকের ক্যাসেটও, সুমন নিজে-হাতে যা রেকর্ড ও মিক্স করেছিলেন। তোমাকে চাই, গড়িয়াহাটার মোড়, তুমি গান গাইলে, কেউ খিদে নিয়ে গান লেখে, গণহত্যার নাম ভূপাল, হারিয়ে যেয়ো না, আমি যাকে ভালোবাসি-র মতো জনপ্রিয় গানকে তার আদিম চেহারায় একটু আটপৌরে, অপ্রস্তুত চেহারায় পাওয়া গেল। সুমনের গান শুনলে উঠতি গাইয়ে হতাশ হতেন। বুঝতেন, এতখানি নিখুঁত দক্ষতা, আঙ্গিকে এত দখল সাধারণের কম্মো নয়। 'নাগরিক' মনে করাল, এই সিদ্ধি একদিনে আসেনি। মাঝখানের চড়াই-পথ একটা ছিল, খানিকটা অগোছালোপনা দিয়ে শুরু দোষের নয়। পরের যুগ একটু আশ্বস্ত হল।

ব্যান্ডের গানের প্রধান অভিজ্ঞান তার দলবদ্ধতা, বন্ধুত্বের বাঁধন। আর, দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এক আকর্ষণীয় সুমধুর আনাড়িভাব। শ্রেষ্ঠ গানগুলি শুনলে মনে হত, এ খুব ধরাছোঁয়ার মধ্যে ব্যাপার—ইচ্ছে করলেই বানিয়ে ফেলা যায়। খেলাটা আসলে এতটা সহজ নয়, কিন্তু এই ধারণাটা গানের কাছাকাছি এসে বসতে সাহায্যই করত। কিছু গান তো গায়কদের চেয়ে ভালো গাওয়াও খুবই সম্ভব মনে হত। গায়ক-শ্রোতার মধ্যে সিদ্ধি-অসিদ্ধির দূরত্বটা এখানে কম। লোকগানের মতো এ-এক সহজিয়া সাধন।

ব্যান্ডের আরেক বৈশিষ্ট্য এর তাৎক্ষণিকতা, তামাশা-প্রবণতা। এ গানের দায় ততটা গানের কাছে নয়, দেশকালের কাছেও ততটা নয়, মূলত দল বেঁধে গেয়ে বাজিয়ে আনন্দ পাওয়া ও উপস্থিতদের দেয়া, এই প্রকৃত ব্যান্ডের লক্ষ্য। কালের নিয়মে এঁরাও বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাংগীতিকভাবে মৌলবাদী হয়েছেন। ভালো গাইয়ে, সম্ভাবনাপূর্ণ বাজিয়ে পেশাগতভাবে সফল হবেন বলে বন্ধুত্ব-রহিতভাবে হিসেব কষে ব্যান্ড বানিয়েছেন। ব্যান্ড-সদস্যরা খবরকাগজের পাতায় ঝগড়া করে সংসার

ভেঙেছেন। কিন্তু গোড়ার দিকের ব্যান্ড বৈশিষ্ট্যের অন্যতম ছিল নিছক সাংগীতিক মজার আদানপ্রদান। পেশা হিসেবে যে সফলও হবে, সে কথা তখনও ভবিষ্যতের গর্ভে।

দেশ-কাল-ব্যক্তিজীবন-সমাজ সব কিছুকেই একটু ব্যতিক্রমীভাবে দেখা হয় ব্যান্ডগানে। প্রায়শই হুতোমি চালের বক্রতায়। পোখরান বিস্ফোরণের গুপ্ত সংকেত Buddha has smiled-এর ব্যঙ্গচিত্র আসে ক্যাকটাসের 'বুদ্ধ হেসেছেন' গানে। যে বাঙালি মন প্রেমিকার চোখকে নিয়ে 'সেই দুটি চোখ আছে কোথায়/কে বলে দেবে আমায়' বেধেছে গুনগুন করেছে, সেখানে জমে ওঠে 'ভূমি'র 'ওরম তাকিও না/ আমি ক্যাবলা হয়ে যাই।' সমকালীন বাঙালির দুর্বল হৃদয় স্বভাবভীরুতাকে ঠেস দেয় 'চন্দ্রবিন্দু'র 'থোড়-বড়ি খাড়া/পুরনো পাজামা/পানসে চেহারা/পারিনা মাসিমা।' এই বাঙালি অবশ্য মনে মনে জানে 'পাঁজিতে লিখেছে কাল বিপ্লব হবে।' 'পথে এবার নামো সাথী'র অমোঘ নাছোড় বিশ্বাস নয়ের দশকে এসে আর তল পায় না। আবার, পুরোনো কলকাতার চেনা-অচেনা-আলো-আঁধারি গলি, সন্ধেবেলার টিউশন, পুরোনো বই-এর ফাঁকে 'ভালো থেকো শুভ জন্মদিন', এমনকি প্রথম পাপ-ও প্রেমের গানে স্থান পায়। প্রেমিকাকে 'এই মায়ার পশম হাত দেবার আরাম' দেয় প্রেমিক। সবমিলিয়ে এ গানের মেজাজ, গন্ধ, লক্ষ্য ও ছাঁদ পূর্বযুগের থেকে আলাদা। প্রতিযুগেই কিছু হাবিজাবি ভিড় করে থাকে প্রকৃত শিল্পের আশপাশে, হাওয়া খোলা করে দেয়—এযুগেও তা ছিল। রেকর্ডিং ও প্রকাশ সহজ হওয়ায় বেনোজল আরও বেশি। সেই স্রোতে নির্ঘাত ভেসে গেছে কিছু প্রকৃত রসময় সৃজন, আমাদের অগোচরে।

ভূমি, চন্দ্রবিন্দু, ক্যাকটাস, পরশপাথর, fossils—পরবর্তীকালে দোহার, মাদল (একটা সময়ে শোনা যায়, হাজার দুয়েক ব্যান্ড ছিল কলকাতায়)—ছাড়া অন্যেরা তেমন দাগ না কাটতে পারলেও, সামগ্রিকভাবে বাংলা গানে ব্যান্ড একটা যুগ রচনা করেছিল একথা নিঃসন্দেহ। আর সফল হোক বা না-হোক, রসোত্তীর্ণ হোক বা না-হোক, তাঁরা যে সবাই মিলে গানবাজনার তুরীয় আনন্দ উপভোগ করেছেন, সে বিষয়েও সন্দেহ নেই।

এই সব্বাই মিলে একসাথে জুটে গানবাজনা, খানিক হল্লা ও ফুর্তি, তারই মধ্যে সমসময়ের আশা-হতাশার কথা নিজের সাধ্যমতো বলা—এটাই ছিল কবিগান, আখড়াই, হাফ-আখড়াই, তরজা, খেমটার যুগের সাধারণ্যের সংগীত। একদিকে মার্গসংগীত, অন্যদিকে রবীন্দ্র-অনুসারীদের উচ্চ-শিল্পাদর্শ যে গানকে আসর-ছাড়া করেছিল, ভদ্রলোকের মনোযোগ ও পাদপ্রদীপের আলো থেকে হারিয়ে গিয়েছিল তার

অস্তিত্ব। থিয়েটারের গানে মাঝেমধ্যে উঁকিঝুঁকি দিলেও, এই অন্তঃসলিলা স্রোত ঘুমিয়ে ছিল কালগর্ভে শতাব্দী খানেকেরও কিছু বেশি। আদৌ যে বেঁচে ছিল, তা প্রমাণ হল ব্যান্ডের যুগের রমরমায়। প্রমাণ হল, তাৎক্ষণিকতার রসে টইটম্বুর জীবনধর্মী প্রাণবান কোনো সংস্কৃতি কখনো মরে না। নতুন কালের অনুকূল পরিবেশে অঙ্কুর আবার ঠিক মাথা তোলে।

ব্যান্ডগুলোর বয়স হল প্রায় আড়াই-তিন দশক। যৌবনধর্ম তাদের ছেড়ে যাবে, গেছে—এটাই স্বাভাবিক। অভিজ্ঞতা ও প্রতিভা নিয়ে ব্যান্ড-বাদীরা কালক্রমে চলচ্চিত্রে লিখেছেন, সুর করেছেন, সাফল্যও পেয়েছেন। একার উচ্চারণ নিয়ে আবার উঠে এসেছেন অনুপম রায়ের মতো কেউ কেউ। মেন-স্ট্রিম, আন্ডার-কারেন্ট, এবং এমনকি সাব-কালচার মিলেমিশে নামছে জন-মনোরঞ্জনের ম্যাচে। কিন্তু সে অন্য আলোচনার বিষয়।